

হরিকাকা

(গল্পগ্রন্থ - কুশল পাহাড়ি)

হরিকাকার আসল নাম ছিল হরিপ্রাণ মুখুজে। নামটা শুনতেভক্তের মতো হলেও হরিকাকা আদৌ ভক্ত ছিলেন না। ছিলেনঅত্যন্ত দুঁদে, মাতাল, প্রবল-প্রতাপাশ্বিত, কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, পরপীড়নদক্ষ, আরো কত কি। অল্প কিছু জমিদারি ছিল, তারই আয়ে দিন চলে যেত। স্বর্গে-মর্তে হরিকাকা কাউকে গ্রাহ্যকরতেন না, অথচ তাঁর দাপটে মেদিনী কাঁপতো।

রাস্তা দিয়ে কেউ হয়তো টেরি কেটে গান গাইতেগাইতে চলেচে, হরিকাকা হুকুম দিতেন—ধরে নিয়ে এসো তোব্যাটাকে। এই, কে যাচ্চ, শোনো ইদিকি।

রায় জেলের ছেলে শ্যামাচরণ। আজকালকার ছেলে বলে সে একটু শৌখিন মেজাজের, একখানা রাঙা গামছাকাঁধে, পান চিবুতে চিবুতে সে যাচ্ছিল সৌরভী জেলেনীর বাড়িআড্ডা দিতে।

হরিকাকা বললেন—কে, শ্যামাচরণ ?টেরি কেটে রাগিণী ভেঁজে যাচ্চ কোথায় ?বাপের পয়সাডাকি আজকাল বেড়েচে ?

শ্যামাচরণ নিরুত্তর।

বলি, কানে কথা গেল না ?উত্তর দাও।

শ্যামাচরণ অধোমুখে দণ্ডায়মান।

—টেরি ভাঙে আমার সামনে। মুখ বুজে চলে যাওআস্তে আস্তে। কখনো আর অমন না দেখি।

শ্যামাচরণের ধীরে ধীরে প্রস্থান।

একবার গ্রামের বৃদ্ধ প্রসন্ন রায়ের কাছ থেকে হৃদয় ঘোষের ছেলে বাবুরাম দু'টাকার বাঁশ কেনে। প্রসন্ন রায়েরঅবস্থা খুব খারাপ, তার ওপর তিনি চোখে ভালো দেখেন না। বাঁশের টাকার জন্যে বাবুরামের বাড়ি হেঁটে হেঁটে প্রসন্নরায়ের পায়ে ব্যথা হয়ে গেল, তবুও টাকা আদায় করা গেলনা। আজ বলে কাল দেবো, কাল বলে শনিবার দেবো। দুমাস এভাবে কাটাবার পরে একদিন প্রসন্ন রায় লাঠি ধরে অতি কষ্টেতার বাড়ি গিয়ে তাগাদা করতেই বাবুরাম রেগে উঠে বুকিবলেছিল—যান যান ঠাকুর, অত তাগাদা কেন ?দু'টাকার বাঁশনিয়ে মুই তো আর পেলিয়ে যাই নি ! মোর যখন হাতে হবে তখন ট্যাকা দেবো। যান আপনি—

এর উত্তরে প্রসন্ন রায় দু-এক কথা কি বলে থাকবেন।

তখন সে প্রায় মারে আর কি প্রসন্ন রায়কে। চোঁচিয়ে উঠে বলে—যাও ঠাকুর, তোমার এক পয়সা ধারিনে ! কি করবেকরণে যাও।

প্রসন্ন রায় এসে হরি রায়ের দরবারে অভিযোগ জানালেন। হরিকাকা অঘোর মুচিকে হুকুম দিলেন—ধরে নিয়েএসো তো ব্যাটাকে। দেখি ওর কতদূর প্রতাপ হয়েছে।

অঘোর মুচি বিখ্যাত লাঠিয়াল, সে হুকুম পেয়ে ঘাড়ধরে নিয়ে এল বাবুরাম ঘোষকে। হরিকাকা বললেন—তুমিপ্রসন্নদার বাঁশের টাকা ধারো ?

বাবুরাম তখন ভয়ে ঠক্ঠক্ করে কাঁপচে। সে বললে, আঙে হ্যাঁ বাবু।

—তবে দাও নি কেন ?

—আঙে হাতে নেই।

—তবে গরিব ব্রাহ্মণের বাঁশ কিনতে গিয়েছিলে কেন ?

—আঙে ভুল হয়ে গিয়েচে।

—ও সব বাজে কথা ছাড়ো। আজ তুমি ওঁকে যা তাবলেচো কেন ?বড্ড নবাব হয়ে গিয়েচো নাকি ?কানমলা খাও।

তখুনি বাবুরাম কানমলা খেলে বিনা প্রতিবাদে।

—আচ্ছা যাও, এই দু'টাকা আমি এখুনি দিচ্ছি। তুমিআমাকে কাল সন্দের মধ্যে যেখান থেকে পারো টাকা দিয়ে যাবে। যাও, চলে যাও।

এই রকম ছিল হরিকাকার বিচার।

গ্রামের বিপদে আপদে হরিকাকা সকলের আশ্রয়স্থল ছিলেন। পর-পীড়নে যেমন দক্ষ, পরোপকারেও তেমনি অগ্রণী। গায়ে শক্তি ছিল অসাধারণ। চামটার বিল রক্ষা করার সময় জমিদারের পক্ষ হয়ে নিজে লাঠি ধরে প্রতিপক্ষমুসলমানদের হটিয়ে দিয়েছিলেন শোনা যায়। মুসলমানরাও খুব মানতো হরিকাকাকে। তাদের পারিবারিক বিবাদেহরিকাকা সালিশি করে গোলমাল মিটিয়ে দিতেন। পাঁচ গ্রামের মোড়লরা তাঁর কাছে এসে পরামর্শ করতো, খেতে না পেলে এসে ধাননিয়ে যেতো। এমনও হয়েছে অভাবগ্রস্তদের ধান বিলিয়ে দিয়েনিজের গোলা শূন্য করে ফেলেছেন হরিকাকা, তখন অপরেরওপর জুলুমবাজিকরে ধান নিয়ে এসেচেন, দাম দেননি। পরেরস্ত্রী বা পরের মেয়ের দিকে একবার কেউ আড়চোখে তাকিয়েছে ঘাটের পথে, কিংবা টপ্পা গানের এক কলি গেয়ে উঠেছে, অমনি সেই মেয়ের কর্তৃপক্ষের অভিযোগে সেই হতভাগ্যপ্রণয়লোভী যুবককে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের বকুলতলায় যেদিনআগাগোড়া জুতোপেটা করে ছাড়লেন—সেই দিনই হয়তোগ্রামের কুমোরপাড়ার কেষ্ট কুমোরের বিধবা মেয়ে কুসীর ঘরেতাকে মদ খেয়ে ডুগিতবলা বাজাতে শোনা গেল রাত একটাপর্যন্ত।

একদিন হয়তো দেখা গেল কুসীকে নিয়ে নৌকোয়হরিকাকা হার্মোনিয়াম বাজাতে বাজাতে গান গাইতে গাইতেমহকুমা শহরের দিকে বাচ্ খেলে চলেচেন—সঙ্গে অবিশ্যিবন্ধুবান্ধব দু'চারটি আছে। সেই বন্ধু আবার কেমন ?হরেমাইতি, বনোদর ঘরামির বড় ছেলে হাফেজ, রসকে মাল, দীনুসর্দার ইত্যাদি।

নবীন চক্কত্তি গ্রামের পুরোহিত ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তিনিশুনে ঘাড় নেড়ে বলতেন—নাঃ, রামপ্রাণ দাদার ছেলে—অমননিষ্কেকাষ্টা হিন্দু এ দিগরে ছিল না, তার ছেলে কিনা মুচি মোচলমান এয়ার নিয়ে মাইফেল করে বেড়াচ্ছে ! লজ্জাওকরে না !

এর এক হপ্তা পরেই পড়লো দুর্গাপূজা। বারোয়ারিতলায়দুর্গোৎসবের ফুল বিল্বপত্র সংগ্রহ, নৈবেদ্য সাজানো, ভোগরাঁধা, বলিদানের ব্যবস্থা, প্রসাদবণ্টন, মায় আরতির আয়োজন, সমাগত মহিলাদের মধ্যে শেতলের ফলমূল বিতরণ প্রভৃতিসমস্ত কাজের মধ্যে রাঙা গামছা মাজায় বেঁধে ঘর্মান্ত দেহে কে ঐ দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, পৈতে-গলায়-মালা-করে-পরা লোকটি ছোটোছোটো করে বেড়াচ্ছে সকাল থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত ?

হরিকাকা !

দীননাথমুখুজ্জেরমাতৃশ্রাদ্ধেঐ রাঙা গামছামাজায় বেঁধে, ঐ পৈতে মালা করে গলায় পরে সারাদিন ব্রাহ্মণ-ভোজনেরসারিতে ভীষণ খেটে পরিবেশন করচে কে ?সামান্য একটু চিনির পানা খেয়ে ? —হরিকাকা !

হরিকাকার এই অবস্থা দেখে কে বলবে ইনি কর্মী ওভক্ত-পুরুষ নন ?

মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া হরিকাকার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। যে কোনো মোকদ্দমায় যে কোনো বিষয়ে সাক্ষী দিতে ওঁরমতো ওস্তাদ বড় কেউ ছিল না গ্রামে। মহকুমার কোর্টেওসবাই ওঁকে চিনতো। প্রতিপক্ষের উকিলের সাধ্য কি জেরাকরে হরিকাকাকে দমিয়ে দেয়। সেই জন্যে মিথ্যে সাক্ষী দিতেসবাই ডাকে ওঁকে। সকলের কাছে খুব আদর। বেশ কিছু আয়ওহয়, আর বিষ্ণু ময়রার দোকানে গরম লুচি, তরকারি, সন্দেশপেট-ভরে খাওয়াও চলে।

সারাজীবন এইভাবে কাটিয়ে হরিকাকার এক অদ্ভুত পরিবর্তন এল আটচল্লিশ বৎসর বয়সে। সেই কথাটা বলবারজন্যেই হরিকাকার এই ইতিহাসের অবতারণা।

আমাদের গ্রাম থেকে দুক্লেশ দূরে নিবান্কা-মদনগঞ্জেরবাঁওড়। এখানে অনেক দিন থেকে এক পুরনো শিবমন্দিরআছে। সেবার সংবাদ রটে গেল কোথা থেকে এক ভৈরবী এসেবাঁওড়ের ধারের মন্দিরে রয়েছেন। এও রটে গেল ভৈরবীরবয়স কম, এবং নাকি সুন্দরী। এই গুজব চাউর হবার পর দলেদলে লোক রওনা দিতে লাগলো, ভৈরবীর দর্শনের আশায়।

ভৈরবীর কাছে লোক-যাতায়াতের ফলে কথাটা আরোবেশি রটে গেল যে ভৈরবীটি তরুণী, রূপসী !

হরিকাকা মাছ ধরতে যেতেন নৌকা করে নিবান্কার বাঁওড়ে। তাঁরা বর্ষার প্রথমে, গাঙে ঘোলা আসবার প্রথমসপ্তাহে, ভীম মাঝির সতেরো পদ ডিঙি ভাড়া করে রাম পালএবং ছিবাস কর্মকারের সঙ্গে তামাক, টিকে, হুকো, কঙ্কে, ছিপ, ছইল, বোতল ইত্যাদির আয়োজন ও উপকরণ সমভিব্যাহারে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে নিবান্কা-মদনগঞ্জের খেয়াঘাটের বাঁ পাশেএকটা পুরনো জামগাছের তলায় মাছ ধরতে বসতেন। এবারওগিয়েছিলেন। গিয়ে সুন্দরী ভৈরবীর কথা শুনেছিলেন নিশ্চয়।

হরিকাকা নাকি একাই একদিন মন্দিরে যান ভৈরবীকে দর্শন করতে। যাঁরা হরিকাকাকে জানেন, তারা বুঝতে পারবেনহরিকাকার সেখানে যাওয়াটার মধ্যে আধ্যাত্মিক কৌতুহলততটা ছিল না, যতটা ছিল একটি নিঃসহায় সুন্দরী নারীকেভালো করে দেখবার ও ফাঁদে ফেলবার দুষ্ট মতলব।

কিন্তু এই যাওয়ার ফল কি হয়েছিল, সেটা এ অঞ্চলেরলোকের কাছে এখনো মানুষের জীবনের একটি রহস্যময়ঘটনা হিসেবে বিখ্যাত।

এই সময়টা আমি মহকুমার বড় স্কুলে ভর্তি হয়েস্কুলের বোর্ডিং-এ চলে যাই। পূজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছি, হরিকাকার মস্ত বড় চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দিয়ে আসবারসময় দেখি বকুলতলায় লোকজন নেই, চণ্ডীমণ্ডপের আগড় বন্ধ, বকুলতলায় কাঠের বেধিগুণ্ডো পাতা নেই—যেন ভোঁভোঁ—ব্যাপার কি ?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি, এমন সময় বাড়ির মধ্যে থেকে একটা কাঠা হাতে রাঙা খুড়িমা বার হয়ে এলেন। আমাকে সদররাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন—কে, নিপু ?বাবা এলি ?ভালো আছিস ?আর বাবা, কি দেখচো, আমার যা হবারখুব হয়ে গিয়েচে—

আমি এত অবাক হয়ে গিয়েচি যে প্রণাম পর্যন্ত করতেভুলে গেলাম। রাঙা খুড়িমার তো বিধবার বেশ নয় দেখচি, তবে কান্নার কারণ কি ?বললাম—কি হয়েছে খুড়িমা ?কাকাকোথায়?

—সে সব শুনবে বাড়ি গিয়ে। সবাই জানে। আর বাবা, আমার কপালে যা হবার ছিল, খুব হল।

বাড়ি গিয়ে প্রথমেই মাকে জিজ্ঞেস করলাম—হরিকাকারকি হয়েছে মা ! রাঙা খুড়িমা কাঁদছিলেন কেন ?

—ভালোই হয়েছে তো। রাঙাদিদির মিথ্যে কান্না।

—কি হয়েছে ?

—সন্নিহি হয়ে গিয়েচে।

—কোথায় ?

—তা কে জানে ?সন্ধান নেই।

—সে কি !

—অনেক সন্ধান করা হয়েছে। কেউ কিছু জানে না।

—হরিকাকা সন্নিহি হয়েছে, একদম নিরুদ্দেশ, কদিনেরকথা এসব ?

- মাস দুই হল একদম নিরুদ্দেশ।
- তার আগে কোথায়ছিলেন ?
- নিবান্ধার সেই ভৈরবীর নাম শুনে গিয়েছিলি ?
- মনে হচ্ছে কথাটা।
- সেই ভৈরবীর ওখানে পড়ে থাকতো।
- ভৈরবী কোথায় ?

—নিবান্ধার মন্দিরেই আছে। কালও আমাদের পাড়া দিয়ে ভিক্ষে করে গেল। রূপে গাঁ আলো করে গেল একেবারে। হরি ঠাকুরপো ভৈরবীর কাছে মন্ত্র নিয়ে না কি নিয়ে ভগবানজানেন, একদম উধাও। রাঙাদিদি কেঁদে কেঁদে খুন—একটাকথাও বলে যায় নি বেচারিকে। একে ছেলেপুলে নেই, কিবিপদে যে পড়েচে ?

না, কেউ কোনো অপবাদ রটাতে পারে নি হরিকাকারনামে, গাঁয়ে সকলের মুখেই এক কথা। ধন্য ভৈরবীর ক্ষমতা। এমন লোকের এমন অদ্ভুত পরিবর্তন বুড়ো বয়সে। সারা জীবনমদ-ভাং খেয়ে ! সুন্দরী ভৈরবী তো এখানেই রয়েছে ! কারো কিছু বলবার উপায় কি ? ধন্য ধন্য করচে সবাই এবং আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম, রাঙা খুড়িমার ওপর কারো তেমনসহানুভূতি নেই। বেশ তো, একটা অসৎ লোকের যদি সৎ পথেপা দেবার প্রবৃত্তি হয়ে থাকে, তাতে রাঙাদিদি দুঃখ না করে বরং আহ্বাদ করুন—ভাবটা এই রকম সাধারণের মনের।

ক্রমে ক্রমে সব শুনলাম ঘটনাটা। তবে একটা কথা, এইসব ঘটনার পক্ষে সাক্ষী কেউ ছিল না। ভৈরবীর সঙ্গে হরিকাকার সাক্ষাৎকারের ইতিহাস চিরকাল লুপ্ত থেকে যেতো, যদি নাসেখানে আরামডাঙার মধু হাড়ি উপস্থিত থাকতো। জনকয়েকলোক সব সময়েই ভৈরবীর ওখানে জুটতো গাঁজা খাওয়ারলোভে।

প্রথম দর্শনের ঘটনাটা এই রকম ঘটে—

ভৈরবী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে হরিকাকার দিকে।

হরিকাকা খানিকটা অবাক হয়ে চেয়ে ছিলেন ভৈরবীরদিকে। মুখে খানিকক্ষণ কথা ছিল না।

ভৈরবী বললে—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

—আজ্ঞে, কইখালি থেকে।

—ও।

—আপনাকে দর্শন করতে এলাম।

—বোসো বাবা।

—বসি।

—কিকর ?

—আজ্ঞে, বিষয়কর্ম করা হয়।

—ব্রাহ্মণ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কুলীন ব্রাহ্মণ ?

—হা মা, আমার নাম হরিপ্রাণ মুখুজে, তিনপুরুশেভঙ্গি। সদানন্দমুখুজের সন্তান। বাঁওনঘাটি গাঁই।

—আমাকে প্রণাম করলে কেন বাবা, তুমি কুলীন ব্রাহ্মণ ?আমি তোমার কত ছোট ! বলেই ভৈরবী নাকি হরিকাকাকে গড়হয়ে প্রণাম করেছিল।

হরিকাকা নীরবে সেখানে বসেছিলেন অনেকক্ষণ, এমনকি মধু হাড়ির দল যখন সন্ধ্যার আগে সেখান থেকে উঠেচলে এল—তখনো হরিকাকা সেখানে চুপ করে বসে আছেন। অনেক রাতে সেদিন তিনি বাড়ি এলেন, চোখে কেমন যেন ফ্যালফেলে দৃষ্টি। রাঙা খুড়িমার মুখে একথা শোনা। সারারাত্ৰহরিকাকা কেবল নাকি পায়চারি করেছেন আর বার বার বাইরের দাওয়ায় গিয়ে বসেছেন। জিগ্যেস করলে বলেছিলেন, বড্ড গরম হচ্ছে। সকালে উঠেই কোথায় চলে গেলেন—দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে তখন বাড়ি এলেন। কেমন যেন অন্যমনস্কভাব। খুড়িমাকে বললেন—দশটা টাকা দিতে পারো ?

—কেন গা ?

—ঠাকুরের পূজো দেবো।

—কি ঠাকুরের ?

—নিবান্দার মন্দিরে যে ঠাকুর ছিল, এ্যাদিন কেউজানতো না। ভৈরবী জাগ্রত করেছে সেই ঠাকুর।

—ভৈরবী তোমায় তুকণ্ডণ করেনি তো ?

—পাগল !

—আমার ভয় করচে কিন্তু।

—যেদিন বুঝবে সেদিন আর ভয় করবে না। ভয় কিসের ?কোনো ভয় নেই।

এর কয়েক মাস পর পর্যন্ত হরিকাকা রোজই বাড়ি আসতেন, কিন্তু ক্রমশতার ধরন-ধারণ বদলাতে লাগলো। অন্য কোনো বাইরের পরিবর্তন—গেরুয়া বস্ত্র ধারণ, বা নিরামিষ আহার—এসব নয়। মদ খাওয়া একদম বন্ধ হল। বাজে লোকনিয়ে আড্ডা আদৌ দেন না। পরকে শাসন করা, চোখ রাঙানোভুলেই গেলেন।

একদিন ঘাটের পথে নির্জন বাঁশবনে সন্ধ্যার কিছু আগে রামযাদু জেলের বিধবা অল্পবয়সী পুত্রবধূ তার আড়াই বছরের ছেলের সঙ্গে নদীর ঘাট থেকে ফিরচে—এমন সময় হঠাৎহরিকাকাকে সামনে দেখে মেয়েটি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।হরিকাকার ভয়ে পাড়ার ঝি-বৌয়েরা অনেকদিন থেকে একানদীর ঘাটে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, একথাটি আগে বলাদরকার।

মেয়েটি থমকে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সর্বনাশ ! হরিমুখুজ্জ যে এগিয়ে আসেন তার দিকে ! খোকা পিছিয়ে এসেততক্ষণ মায়ের আঁচল মোক্ষম জড়িয়ে ধরেছে, তার ভীত দৃষ্টিহরিকাকার মুখের দিকে নিবন্ধ।

হরিকাকা কিন্তু মেয়েটির কাছে এগিয়ে এসে সস্নেহ সুরেবললেন—মা, ভয় কি ?নির্ভয়ে ঘাটে-পথে বেরিও মা। এই খোকাকে কষ্ট দিয়ে কেন সঙ্গে এনেচ ?ও কি এতটা পথ হাঁটতেপারে ?ছিঃ—কোনো ভয় নেই। তুমি আমার মেয়ের সমান।আমি তোমার বাবা, বাবাকে দেখে ভয় কি মা ?যাও।

মেয়েটি হেঁট হয়ে হরিকাকাকে প্রণাম করে তাড়াতাড়িবাড়ি চলে এসে পাড়ার মেয়ে-মহলে একথা জানায়। এর দুতিনদিন পরে রামযাদু একটা কাতলা মাছ হাতে হরিকাকার বাড়ি এসে তাঁকে দিয়ে বললে—আপনার মেয়ে পেটিয়ে দিয়েচে।বললে, মোর বাবাঠাকুরকে দিয়ে এসো। তা নেন দয়া করে।

হরিকাকা চণ্ডীমণ্ডপে বসে তেল মাখছিলেন, কাহেনিরু গোয়ালিনী বসে দুধের হিসাব করছিল, চোখ তুলেবললেন—কি ?কিসের মাছ ?

—আপনার মেয়ে পেটিয়েচে। জেয়ানাতে পেয়েলাম, আপনার মেয়ে বললে, বাবাকে দিয়ে এসো—

—ও হবে না।

—কেন বাবা ঠাকুর ?

—গরিব লোকের মাছ আমি বিনি পয়সায় নিতে পারবো না।

এ ধরনের কথা এ অঞ্চলে কেউ কখনো বলে না, বিশেষকরে হরিকাকা তো এমন প্রকৃতির লোকই নয়। রামযাদু একটুঅবাক না হয়ে পারলে না। তবুও মাছটা সে নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল, হরিকাকা বললেন—না, শোন, ও রামযাদু, মাছআমি নেবো না। ওর ন্যায্য দাম দেওয়ার আমার ক্ষমতা নেই। সুতরাং মাছও আমি নেবো না—

শেষ পর্যন্ত রামযাদুকে মাছ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হল। রামযাদুরস্ত্রীএর পর একসময়ে এসে খানিকটা কাটা মাছ রাঙা খুড়িমার কাছে লুকিয়ে দিয়ে গিয়েছিল।

এই রকম দু'একটা নতুন ধরনের কাজ করার পরহরিকাকা একদিন সকালে উঠে ভৈরবীর মন্দিরে চলেগেলেন—আর ফিরলেন না। ভৈরবীর কাছে সন্ধান নেওয়া হয়েছিল। সেখানকার সকলেই বললে ধোপের বাড়ি কাপড়দেবেন বলে তিনি সকাল সকাল উঠে চলে গিয়েছিলেন।

অনেক দিন কেটে গেল তারপর।

রাঙা খুড়িমা আরো কিছুদিন পরে বাপের বাড়ি চলেগেলেন। বছর দুই পরে তাঁর এক ভাইপো এসে এখানকার বিষয়-আশয় বিক্রি করে চলে গেল, তার মুখে শুনলাম রাঙাখুড়িমার মৃত্যু হয়েছে।

জিনিসটা মিটে গেল। আমাদের গ্রামের মধ্যে হরিকাকার ইতিহাস একটা মনোহর কাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে গেল।ওদের ভিটেতে ঘন জঙ্গল হয়ে গেল, দিনমানের সেখানে নাকিবাঘ লুকিয়ে থাকে, শুধু দাঁড়িয়ে রইল সিংহদরজাটা—কাঠখামালের মাথায় দুটো বড় জিউলি গাছ আর একটা অশ্বথ গাছনিয়ে। কাঠের কবাট দুটোও কারা খুলে নিয়ে গেল কিছুকালপরে।

আমি কলকাতায় চাকরি করি, সস্তা ভাড়ায় দেশভ্রমণকরতে বেরিয়েছি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। সারনাথ যাবার পথেপাঁড়েপুর নেমেছি আমরা, সেখানকার বিখ্যাত ক্ষীরের পানতুয়াখাবার জন্যে। রামলীলা উৎসবের জন্যে পাঁড়েপুর চৌমাথারমোড়ে একটা উঁচু মাচা বেঁধেছে, সেটা রঙিন কাগজের মালায়সাজাবে, লোকজনও অনেক জমেচেতার চারিধারে। আমাদেরটাঙাওয়ালা দুজন বললে—বাবুজি, টাঙা এগিয়ে গাছতলায়রাখি !

—কেন ?

—ইহাপর বহু ভিড় জমতা। লেकिन দেরি মাং কিজিয়েআপলোগ, সাম হো জায়গা—

আধঘণ্টা পরে যখন পেটপুরে সস্তা ক্ষীরের পানতুয়া খেয়ে আমরা সাতজন বন্ধু টাঙার সন্ধান করলাম, টাঙা আর নেই ! সে কি, টাঙা গেল কোথায় ?

হরিধন বললে—এগিয়ে দেখা যাক আরো। গাছতলায়থাকবে বলেছিল—এই তো গাছতলা। দেখি কতদূর গেল।

রশিদুই পথ এগিয়ে বাঁকের মাথায় টাঙা দুখানা দাঁড়িয়েআছে দেখা গেল। সেইখানে গাছতলায় এক সাধুর আসনেরচারপাশে অনেকগুলি লোক জুটেচে, টাঙাওয়ালা দুজনওসেখানে জমেচে।

আমরা বকাবকি করতে একজন টাঙাওয়ালা বললে— বাবুজি, বাঙালি সাধু হ্যাঁয় !

সবাই কৌতুহলী হয়ে উঠলাম। কোথায়, ওই সাধু নাকি ?বাঙালি ?

এইভাবে আবার হরিকাকার দেখা পেলাম।

আমি চিনি নি, তিনি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকেবললেন—বিষ্টু দাদার ছেলে অমল না ?

আমি অবাক, বন্ধুরা অবাক। আমি কখনোই এইঅপরিচিত পরিবেশে এই জটাভূটধারী দাড়িওয়ালা বৃদ্ধসাধুকে আমাদের সেই হরিকাকা বলে চিনে নিতে পারতামনা, দীর্ঘ তেরো-চোদ্দ বছর পরে। কিন্তু তাঁর গালের আঁচিলআমার অত্যন্ত পরিচিত, শৈশবের আবেষ্টনীতে তাকে নিয়েগিয়ে ফেললো। রাঙা খুড়িমার কান্নাভরা চোখ মনে এল, কি জানি কেন ওঁদের সেই জঙ্গলে-ভরা সিংহদরজাটার কথা মনেহল। আমিও দেশের বাড়ি ছেড়েচি পাঁচ-ছ'বছর। হঠাৎ এভাবেবাল্যের হরিকাকার দেখা পেয়ে সারনাথ ভুলে গেলাম, বন্ধুবান্ধবদের ভুলে গেলাম, গণেশ মহল্লার প্রসিদ্ধ রামলীলাউৎসবের কথা ভুলে গেলাম। বন্ধুদের বললাম—তোমরাসারনাথ যাও, আসবার সময় আমায় নিয়ে নিয়ো—কিংবা আমিআজ না হয় পাঁড়েপুরে থেকেই যাই—

ওরা বললে—কোথায় থাকবি এখানে ?

—একটা হোটেল কিংবা সরাই—

—না, সে সবে দরকার নেই। আচ্ছা তুমি গল্প কর দেশেরলোকের সঙ্গে। যাবার সময় যেয়ো।

ওরা চলে গেল। নীল প্রশান্ত আকাশ। বড় আমগাছেরছায়াভরা বীথি। বৃদ্ধদেবের চরণপূত সারনাথ কাছে। সেইদোঁর্দগুপ্রতাপ মাতাল হরিকাকা সন্ন্যাসী। কি অদ্ভুত লাগছিলআজকের এই দিনটা !

আমি আমতলায় বসে পড়লাম। বৃদ্ধ সাধু বললেন— তুমি এখানে কি ভাবে ?

—সারনাথ যাচ্ছিলাম বন্ধুদের সঙ্গে।

—কি কর ?

—টেকনিকেল স্কুলে মাস্টারি করি বালিগঞ্জ। আপনি কিএখানে থাকেন ?

—না। দিন পনেরো আগে এসেচি কাশী থেকে।

কত কথা মনে হচ্ছিল। কোনটা আগে বলবো, কোনটাজানতে চাইব ?রাঙা কাকীমার মৃত্যুসংবাদ দিলাম। হরিকাকারমুখের ভাবের কোনো পরিবর্তন হল না। চুপ করে রইলেন।বললেন—তোমার বাবা কেমন আছেন ?

মারা গেছেন আজ সাত বছর।

—গাঁয়ের আর সবাইকার কি খবর ?

মোটামুটি বললাম যতদূর সম্ভব। গত পাঁচ বছরের খবরআমিও ঠিকমতো জানি না বললাম। বেশি কিছু কথা হবারপূর্বেই বন্ধুরা পাছে এসে পড়ে—এই ছিল আমার ভয়। কোনকথাটা আগে জিগেস করবো ?হঠাৎবললাম—কেমন আছেনহরিকাকা ?

হরিকাকা ধীরে ধীরে বললেন—খুব শান্তিতে, খুব আনন্দেআছি বাবা।

তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—অনেকঅপরাধ করেছিলাম জীবনে না বুঝতে পেরে। তিনি দয়াময়, সব ক্ষমা করবেন। আমরা তাঁর সন্তান। তিনি না ক্ষমা করলে যাচ্ছি কোথায় !

—এখন এখানেই থাকবেন ?

—বাবা, আমরা এখনো বহুদূর।কুটীচকে পোঁছতে এখনোদেরি আছে। কবে কোথায় থাকি ঠিক নেই।তিনি যেখানে নিয়োযান সেখানে যাবো। তিনি এখানে এনেছিলেন তাই তোমার সঙ্গে দেখা হল।

—গাঁয়ে ফিরতে ইচ্ছে হয় না কাকাবাবু ?

—আগে আগে হত, এখন আর হয় না বাবা। তোমারখুড়িমা চলে গিয়েছেন, এখন আর কোনো বন্ধনই নেই। কিদেখতে যাবো ?

—খুড়িমা মারা গিয়েছেন আমার মুখে শুনলেন তো ?

—না।

—কেউ চিঠি লিখেছিল ?

—না। থাক সে কথা বাবা।

ইতিমধ্যে বন্ধুবান্ধবদের দল এসে পড়লো। হরিকাকাকে তারা পাঁড়েপুরের পানতুয়া কিনে দিলে এক ভাঁড়। হাসিমুখে গ্রহণ করলেন। আমরা সবাই পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলাম। ঊঁকে একা গাছতলায় ছেড়ে দিয়ে আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমাদের সকলকে আশীর্বাদ করলেন। টাঙায় উঠবার সময় আমার চোখে জল এল।